দুঃখ কাহাকে বলে এর প্রায় সবই কবিগুরু পেয়েছিলেন এক জীবনে। অভিজাত-বংশের জমিদারপুত্র রবীন্দ্রনাথ। সোনার চামচ মুখে নিয়ে যার জন্ম।বাইরের রূপ জমিদার এবং ভেতরের রূপ একজন সংবেদনশীল মানুষ ও কবি।রবীন্দ্রনাথকে আমরা জানি একজন সুখী মানুষ, একজন জমিদারের ছেলে, যার কোনো অভাব-অনটন নেই, সম্মানীয় ব্যক্তি, কবি ও একজন নিবিড় প্রেমিকের মাত্রায়। অথচ তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ছিল দুঃখ ও শোকে ভারাক্রান্ত।

\*\* মাত্র ১৩ বছর বয়সে তিনি মাতৃহারা হন। তাঁর বিয়ের রাতে তাঁর জ্যেষ্ঠ ভগ্নিপতি সারদা প্রসাদ মারা যান। এর চার মাস পর তার সবচেয়ে প্রিয় বৌদি কাদম্বরী দেবী, যিনি তাকে মাতৃহারা বেদনা ভুলিয়ে ভালোবাসা ও পৃষ্ঠপোষকতার মাধ্যমে কবি হয়ে ওঠার প্রেরণা জোগাচ্ছিলেন, ঠিক সে সময় তিনি আফিম খেয়ে আত্মহত্যা করেন।

\*\* মাত্র ৪১ বছর বয়সে শেষ হয়ে যায় রবীন্দ্রনাথের দাম্পত্যজীবন। ১৯০২ সালে তাঁর স্ত্রী মৃণালিনী দেবী মারা যান। রেখে যান তিন মেয়ে ও দুই ছেলে।তারা হলেন শমীন্দ্রনাথ, রথীন্দ্রনাথ, মাধূরী লতা বা বেলা, রেনুকা বা রানী ও মীরা বা অতশী।

\*\* স্ত্রী মৃণালিনী দেবী মারা যাওয়ার পর রানী (রেনু) খুব অসুস্থ হয়ে পড়ে। এই মেয়েকে তিনি বিয়ে দিয়েছিলেন সত্যেন্দ্রনাথের সঙ্গে। যাকে তিনি নিজের পয়সায় বিলেত পাঠিয়েছিলেন ডাক্তারি পড়তে। মৃত্যুপথযাত্রী এই কন্যা রানীকে বহু চেষ্টা করেও বাঁচানো যায়নি। রানীকে হারাবার পর ১২ বছরের শমী তখন বন্ধুর সাথে মুঙ্গেরে বেড়াতে যায়। সেখানে শমীর কলেরা হয়। কলেরায় শমী মারা যায়।

\*\* সবচাইতে কষ্টের মৃত্যু হয় বড় মেয়ের।কবির আদুরে মেয়ে মাধুরী লতা বা বেলা যাকে কোলেপিঠে করে তিনি মানুষ করেছিলেন, তাকে বিয়ে দিয়েছিলেন কবি বিহারী লালের ছেলে শরৎচন্দ্রের সাথে। বিয়ের পর রবীন্দ্রনাথ শরৎকে বিলাতে পাঠিয়েছিলেন ব্যারিস্টারি পড়তে। বিলাত থেকে ফিরে এসে মেয়ে এবং তার জামাই শরৎচন্দ্র জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতে চার বছর ছিলেন। এই ঠাকুরবাড়িতে শরৎচন্দ্রের সাথে কবির ছোট জামাই নগেন্দ্রনাথের বিবাদের সূত্র ধরে শরৎচন্দ্র বাড়ি ছেড়ে স্ত্রীকে নিয়ে শ্রীরামপুরের পৈতৃক নিবাসে চলে যান। এরপর রবীন্দ্রনাথের সাথে শরৎচন্দ্রের সম্পর্কের ইতি ঘটে। এই টানাপড়েনের মধ্য দিয়ে বুকভরা অভিমান নিয়ে বেলা মৃত্যুর দুয়ারে গিয়ে পৌঁছে। শ্রীরামপুরে গিয়ে বেলার অসুখ খুব খারাপের দিকে চলে যায়। রবীন্দ্রনাথ প্রতিদিন গাড়িতে করে গিয়ে মেয়েকে দেখে আসতেন। বাবার হাত ধরে মেয়ে বসে থাকত। তখন শরৎচন্দ্র টেবিলের ওপর পা রেখে সিগারেট খেয়ে রবীন্দ্রনাথের প্রতি অপমানকর মন্তব্য করত। আর সে অপমান নীরবে সহ্য করে রবীন্দ্রনাথ দিনের পর দিন মেয়েকে দেখতে যেতেন। একদিন দেখতে গেছেন বেলাকে, কিন্তু মাঝপথে শুনলেন বেলা মারা গেছে। মেয়ের মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি আর ওপরে উঠলেন না। মেয়ের শেষ মুখটি না দেখে ফিরে এলেন বাড়িতে। হৈমন্তীর গল্প যেন কবির মেয়েরই গল্প!

\*\* কবির ছোট মেয়ে মীরার বিয়ে হয় ১৩ বছর বয়সে। রবীন্দ্রনাথ নারীমুক্তি আন্দোলন করেছিলেন কিন্তু মেয়েগুলোকে বিয়ে দিয়েছিলেন খুব অল্প বয়সে ১২-১৩, কারো বা ১১ বছর বয়সে। মীরার বিয়ে হয়েছিল নগেন্দ্রনাথের সাথে। বিয়ের পর কবি নগেন্দ্রনাথকে আমেরিকায় পাঠিয়েছিলেন কৃষিবিদ্যা শেখার জন্য। রবীন্দ্রনাথের ইচ্ছা ছিল স্বদেশের কৃষিকাজের উন্নতিকল্পে নগেন্দ্রনাথকে কাজে লাগাবেন। কিন্তু নগেন্দ্রনাথ বিদেশে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের কাছে বারবার চিঠি লিখতেন, আমার টাকার দরকার, আমার টাকার দরকার। উত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখতেন আমার জমিদারি থেকে মাত্র আমি পাঁচশত টাকা গ্রহণ করি। এ টাকা তো আমি পুরোটাই তোমাকে দিয়ে দেই। এখন আমি ধারের উপরে আছি।

ছোট জামাই আমেরিকা থেকে গ্র্যাজুয়েশন করে ফিরে আসেন ঠিক কিন্তু মীরার ভাগ্যে বেশি দিন স্বামীসঙ্গ লাভ হলো না। মীরা এক ছেলে ও এক মেয়ের মা হওয়ার পর নগেন্দ্রনাথ খ্রিষ্টান হয়ে মীরাকে ছেড়ে চলে যান। মীরার ছেলে নীতুকে রবীন্দ্রনাথ প্রকাশনা শিল্পে শিক্ষার জন্য জার্মানিতে পাঠান, কিন্তু কবির এমনই দুর্ভাগ্য মাত্র ২০ বছর বয়সে নীতু ক্ষয় রোগে (যক্ষ্মায়) আক্রান্ত হয় এবং রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর নয় বছর আগে নীতু মারা যায়।

\*\* শোক কতটা গভীর হলে কবির কলম দিয়ে বের হলো -

"আছে দুঃখ, আছে মৃত্যু, বিরহদহন লাগে।

তবুও শান্তি, তবু আনন্দ, তবু অনন্ত জাগে ॥" মানুষের জীবনে দুঃখ আছে, মৃত্যু আছে কিন্তু পৃথিবী এক জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই। পৃথিবী অনন্তের দিকে ধাবিত। এটাই রবীন্দ্রসঙ্গীতের মূল সূর। তবুও আমরা চলব, জীবন চলবে। অনন্তের সন্ধানী রবীন্দ্রনাথ, দুঃখ এবং মৃত্যুকে জয় করে জীবনকে করেছেন জীবন্ত।

\*\* তিনি যে কত দুঃখের ভেতর দিয়ে জীবন কাটিয়েছিলেন তা বাইরের রবীন্দ্রনাথকে দিয়ে বোঝা যায় না। যেকেউ বড়মাপের কবি হন বা ছোটমাপের কবি হন, সবাই সমাজের একটি স্বীকৃতি চায়, মূল্যায়ন চায়, রবীন্দ্রনাথ বহু দিন সেটা বাঙালি সমাজের কাছে পাননি। এ দুঃখবোধ তার মধ্যে সব সময় ছিল। কারণ নোবেল পুরস্কার (১৯১৩ খ্রি:) পাওয়ার পর যখন তাকে সংবর্ধনা দেয়া হলো তখন তিনি বললেন, ‘আমি এই সম্মানের পাত্রকে ওষ্ঠ পর্যন্ত তুলব কিন্তু গলা পর্যন্ত ঢুকতে দেব না।’ কত বড় অভিমান ও দুঃখ নিয়ে মানুষ এ কথাটি বলে তা আমাদের ভাবতে হবে।

\*\* কবির মৃত্যু হলো অতিমাত্রায় কষ্ট সহ্য করে।কী কারনে যেন কবির বড় ছেলে রথীন্দ্রনাথের কাছ থেকে শেষ বিদায়টাও পাননি। দূর সম্পর্কের এক নাতনি ছিলো কবির শেষ বিদায়ের ক্ষণে।

প্রথম যৌবনে যে গান লিখলেন, এইটাই যেন কবির শেষ জীবনে সত্যি হয়ে গেলো-

"আমিই শুধু রইনু বাকি।

যা ছিল তা গেল চলে, রইল যা তা কেবল ফাঁকি......

বল্‌ দেখি মা শুধাই তোরে--

আমার কিছু রাখলি নে রে,

আমি কেবল আমায় নিয়ে কোন্‌ প্রাণেতে বেঁচে থাকি॥"

( তথ্যসুত্র : দৈনিক নয়াদিগন্ত,গুগল। ফেসবুকে যে লেখাটি ছিল তার সাথে বেশ কিছু অংশ পত্রিকা থেকে নিয়ে সংযোজন করেছি)